সেঁজুতি

সেঁজুতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
২১০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা।

সেঁজুতি

SHELF LISTED

প্রথম সংস্করণ ভাদ্র, ১৩৪৫ সাল।

7525

মূল্য—দুই টাকা।

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ডাক্তার সার নীলরতন সরকার
বন্ধুবরেষু—

অন্ধ তামস গহ্বর হতে
ফিরিনু সূর্যালোকে।
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে।
মর্ত্যের প্রাণ-রঙ্গভূমিতে
যে-চেতনা সারারাতি
সুখ দুঃখের নাট্যলীলায়
জ্বেলে রেখেছিল বাতি
সে আজি কোথায় নিয়ে যেতে চায়
অচিহ্নিতের পারে,
নব প্রভাতের উদয়সীমায়
অরূপলোকের দ্বারে।
আলো আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা,
ঝিমিঝিমি করে শিরায় শিরায়
দূর নীলিমার ভাষা॥

সে ভাষার আমি চরম অর্থ
জানি কিবা নাহি জানি,—
ছন্দের ডালি সাজানু তা দিয়ে,
তোমারে দিলাম আনি'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১ শ্রাবণ, ১৩৪৫

সূচী

জন্মদিন	আজ মম জন্মদিন	১
পত্রোত্তর	চির প্রশ্নের বেদী-সম্মুখে	৮
যাবার মুখে	যাক্ এ জীবন	১২
অমর্ত্য	আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা	১৬
পলায়নী	যে পলায়নের অসীম তরণী	১৮
স্মরণ	যখন রবো না আমি মর্ত্যকায়ায়	২২
সন্ধ্যা	চলেছিল সারা প্রহর	২৫
ভাগীরথী	পূর্বযুগে, ভাগীরথী, তোমার চরণে দিল আনি	২৮
তীর্থযাত্রিণী	তীর্থের যাত্রিণী ও যে	৩১
নতুন কাল	কোন্ সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর	৩৪
চলতি ছবি	রোদ্দুরেতে ঝাপসা দেখায়	৩৮
ঘর ছাড়া	তখন একটা রাত	৪২
জন্মদিন	দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ	৪৬
প্রাণের দান	অব্যক্তের অন্তঃপুরে উঠেছিলে জেগে	৪৯
নিঃশেষ	শরৎ বেলার বিত্তবিহীন মেঘ	৫০
প্রতীক্ষা	অসীম আকাশে মহাতপস্বী	৫১
পরিচয়	একদিন তরীখানা থেমেছিল	৫৩
পালের নৌকা	তীরের পানে চেয়ে থাকি	৫৬

চলাচল	ওরা তো সব পথের মানুষ	৫৮
মায়া	করেছিনু যত সুরের সাধন	৫৯
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	রেখার রঙের তীর হতে তীরে	৬১
ছুটি	আমার ছুটি আসছে কাছে	৬২

সেঁজুতি

জন্মদিন

আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে কী জানি
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি
সেথা গেছে ছিন্ন হয়ে ; নবসূত্রে পড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে নূতন অরুণলিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।

আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারাসম,
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।

প্রাচীন অতীত, তুমি
নামাও তোমার অর্ঘ্য; অরূপ প্রাণের জন্মভূমি
উদয়শিখরে তার দেখো আদি জ্যোতি। করো মোরে
আশীর্বাদ, মিলাইয়া যাক তৃষাতপ্ত দিগন্তরে
মায়াবিনী মরীচিকা। ভরেছিনু আসক্তির ডালি
কাঙালের মতো, অশুচি সঞ্চয়পাত্র করো খালি,
ভিক্ষামুষ্টি ধুলায় ফিরায়ে লও, যাত্রাতরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে-চেয়ে
জীবন-ভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।

হে বসুধা
নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে—যে তৃষ্ণা যে ক্ষুধা
তোমার সংসার-রথে সহস্রের সাথে বাঁধি’ মোরে
টানায়েছে রাত্রি দিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানা দিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল ক’মে
ছুটির গোধূলিবেলা তন্দ্রালু আলোকে। তাই ক্রমে

ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো ; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্য পানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ,
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু জানি
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি'।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ, তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু করো, যদি মোরে করো অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন করো নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধো বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দিরবেদীতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ন র'বে সগৌরবে, তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব।

ভাঙো ভাঙো. উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি'
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে, ভালবাসিয়াছি।
সেই ভালবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি

ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালবাসা
সব ক্ষয়ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট র'বে ; তার ভাষা
হয়তো হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লান স্পর্শ লেগে
তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে র'বে যদি উঠি জে'গে
মৃত্যু-পরপারে। তারি অঙ্গে এঁকেছিল পত্রলিখা
আম্রমঞ্জরীর রেণু, এঁকেছে পেলব শেফালিকা
সুগন্ধি শিশির কণিকায় ; তারি সূক্ষ্ম উত্তরীতে
গেঁথেছিল শিল্পকারু প্রভাতের দোয়েলের গীতে
চকিত কাকলী সূত্রে ; প্রিয়ার বিহ্বল স্পর্শখানি
সৃষ্টি করিয়াছে তার সর্ব দেহে রোমাঞ্চিত বাণী,
নিত্য তাহা রয়েছে সঞ্চিত। যেথা তব কর্মশালা
সেথা বাতায়ন হতে কে জানি পরায়ে দিত মালা
আমার ললাট ঘেরি সহসা ক্ষণিক অবকাশে,
সে নহে ভৃত্যের পুরস্কার ; কী ইঙ্গিতে কী আভাসে
মুহূর্তে জানায়ে চলে যেত অসীমের আত্মীয়তা
অধরা অদেখা দূত, ব'লে যেত ভাষাতীত কথা
অপ্রয়োজনের মানুষেরে।

সে মানুষ, হে ধরণী,
তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবে যবে, নিয়ো তুমি গনি'

যা কিছু দিয়েছ তারে, তোমার কর্মীর যত সাজ,
তোমার পথের যে পাথেয়, তাহে সে পাবে না লাজ ;
রিক্ততায় দৈন্য নহে। তবু জেনো অবজ্ঞা করিনি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী—
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান। যবে আলোতে আলোতে
লীন হোত জড় যবনিকা, পুষ্পে পুষ্পে তৃণে তৃণে
রূপে রসে সেই ক্ষণে যে গূঢ় রহস্য দিনে দিনে
হোত নিঃশ্বসিত, আজি মর্ত্যের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুঁজি'।

যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে
তোমার অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে
মুক্তদ্বার ; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত ;
তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি', নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা

শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি'
বীভৎস চীৎকারে তা'রা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।

শুনি তাই আজি
মানুষ জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি'।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, ব'লে যাব, এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু র'বে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
ব'লে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে
শেষ প্রহরের ঘণ্টা; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে

সেঁজুতি

শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পুরবীর সুরে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক’টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে, দিনান্তের শেষ পলে
র’বে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।
আর র’বে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর র’বে খেয়াতরীহারা
এপারের ভালবাসা, বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে, রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে॥

গৌরীপুর ভবন, কালিম্পং।
২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৫

পত্রোত্তর

(ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লিখিত)

বন্ধু,

চিরপ্রশ্নের বেদী-সম্মুখে চিরনির্বাক রহে
বিরাট নিরুত্তর,
তাহারি পরশ পায় যবে মন নম্র ললাটে বহে
আপন শ্রেষ্ঠ বর।
খনে খনে তারি বহিরঙ্গণ-দ্বারে
পুলকে দাঁড়াই, কত কী যে হয় বলা,
শুধু মনে জানি বাজিল না বীণাতারে
পরমের সুরে চরমের গীতিকলা॥

চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখা দেয় সুন্দর,
—দেয় না তবুও ধরা,
মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা।

আলোকধামের আভাস সেথায় আছে
মর্ত্যের বুকে অমৃত পাত্রে ঢাকা ;
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে,
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা ॥

তারি আহ্বানে সাড়া দেয় প্রাণ, জাগে বিস্মিত সুর,
নিজ অর্থ না জানে।
ধূলিময় বাধাবন্ধ এড়ায়ে চলে যাই বহুদূর
আপনারি গানে গানে।
দেখেছি, দেখেছি, এই কথা বলিবারে
সুর বেধে যায়, কথা না জোগায় মুখে,
ধন্য যে আমি সে কথা জানাই কারে
পরশাতীতের হরষ জাগে যে বুকে ॥

দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে, অশ্লীল দিনে রাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে,
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে
ঘটেছে তা বারে বারে।

তবু তো বধির করেনি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে, কে দিয়েছে সুর আনি,
পরুষ-কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী।

যাহা জানিবার কোনোকালে তার জেনেছি যে কোনো কিছু
—কে তাহা বলিতে পারে।
সকল পাওয়ার মাঝে না-পাওয়ার চলিয়াছি পিছু পিছু
অচেনার অভিসারে।
তবুও চিত্ত অহেতু আনন্দেতে
বিশ্বনৃত্যলীলায় উঠেছে মেতে।
সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাব,
মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব।

ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাঁধনছেঁড়ার রবে
নিখিল আত্মহারা।
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে,
এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে;
নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি,
যাব অলক্ষ্যে সূর্যতারার সাথী॥

সেঁজুতি

কী আছে জানি না দিন-অবসানে মৃত্যুর অবশেষে ;
এ প্রাণের কোনো ছায়া
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রং অস্তরবির দেশে,
রচিবে কি কোনো মায়া।
জীবনেরে যাহা জেনেছি, অনেক তাই,
সীমা থাকে থাক্, তবু তার সীমা নাই।
নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেরে জানে ॥

মংপু, দার্জিলিং
১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

যাবার মুখে

যাক্ এ জীবন,
যাক্ নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লোটে ধূলি'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক।
যাক্ এ জীবন পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক্।
টুকরো যা থাকে ভাঙা পেয়ালার,
ফুটো সেতারের স্থরহারা তার,
শিখা-নিবে-যাওয়া বাতি,
স্বপ্নশেষের ক্লান্তি-বোঝাই রাতি ;—
নিয়ে যাক্ যত দিনে দিনে জমা-করা
প্রবঞ্চনায় ভরা
নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়।
কুড়ায়ে ঝাঁটায়ে মুছে নিয়ে যাক, নিয়ে যাক শেষ করি'
ভাঁটার স্রোতের শেষ-খেয়া-দেওয়া তরী।

সেঁজুতি

নিঃশেষ যবে হয় যত কিছু ফাঁকি
তবুও যা রয় বাকি—
জগতের সেই
সকল কিছুর অবশেষেতেই
কাটায়েছি কাল যত অকাজের বেলায়,
মন ভোলাবার অকারণ গানে কাজ-ভোলাবার খেলায়।
সেখানে যাহারা এসেছিল মোর পাশে
তা'রা কেহ নয় তা'রা কিছু নয় মানুষের ইতিহাসে।
শুধু অসীমের ইশারা তাহারা এনেছে আঁখির কোণে,
অমরাবতীর নৃত্যনূপুর বাজিয়ে গিয়েছে মনে।
দখিন হাওয়ার পথ দিয়ে তা'রা উঁকি মেরে গেছে দ্বারে,
কোনো কথা দিয়ে তাদের কথা যে বুঝাতে পারিনি কারে।
রাজা মহারাজ মিলায় শূন্যে ধুলার নিশান তুলে,
তা'রা দেখা দিয়ে চলে যায় যবে ফুটে ওঠে ফুলে ফুলে।
থাকে নাই থাকে কিছুতেই নেই ভয়,
যাওয়ায় আসায় দিয়ে যায় ওরা নিত্যের পরিচয়।
অজানা পথের নামহারা ওরা লজ্জা দিয়েছে মোরে
হাটে বাটে যবে ফিরেছি কেবল নামের বেসাতি ক'রে॥

আমার দুয়ারে আঙিনার ধারে ঐ চামেলির লতা
কোনো দুর্দিনে করে নাই কৃপণতা।

সেঁজুতি

ওই যে শিমুল ওই যে সজিনা আমারে বেঁধেছে ঋণে,—
কত যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে
কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে,
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।
সকালবেলার প্রথম আলোয় বিকালবেলার ছায়ায়
দেহপ্রাণমন ভরেছে সে কোন্ অনাদিকালের মায়ায়।
পেয়েছি ওদের হাতে
দূর জনমের আদি পরিচয় এই ধরণীর সাথে।
অসীম আকাশে যে প্রাণ-কাঁপন অসীম কালের বুকে
নাচে অবিরাম, তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে।
যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে।
সেই সত্যেরি ছবি
তিমিরপ্রান্তে চিত্তে আমার এনেছে প্রভাত-রবি।
সে রবিরে চেয়ে কবির সে বাণী আসে অন্তরে নামি'—
"যে আমি রয়েছে তোমার আমায় সে আমি আমারি আমি।"
সে আমি সকল কালে,
সে আমি সকল খানে,
প্রেমের পরশে সে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।

যায় যদি তবে যাক,
এল যদি শেষ ডাক,—

অসীম জীবনে এ ক্ষীণ জীবন শেষ রেখা এঁকে যাক,
মৃত্যুতে ঠেকে যাক।
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লুটে ধূলি'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক—
যাক নিয়ে তাহা, যাক এ জীবন যাক ॥

শান্তিনিকেতন
২২ মাঘ, ১৩৪৩

অমর্ত্য

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা।—
ঐখানে মোর বাসা
যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস,
যার পরে ঐ মন্ত্র পড়ে দক্ষিণে বাতাস।
চিরদিনের আলোক-জ্বালা নীল আকাশের নিচে
যাত্রা আমার নৃত্য-পাগল নটরাজের পিছে।
ফুল ফোটাবার যে রাগিণী বকুল শাখায় সাধা
নিষ্কারণে ওড়ার আবেগ চিলের পাখায় বাঁধা,
সেই দিয়েছে রক্তে আমার ঢেউয়ের দোলাদুলি
স্বপ্নলোকে সেই উড়েছে সুরের পাখ্না তুলি’।
দায়-ভোলা মোর মন
মন্দে ভালোয় সাদায় কালোয় অঙ্কিত প্রাঙ্গণ
ছাড়িয়ে গেছে দূর দিগন্তপানে
আপন বাঁশির পথ-ভোলানো তানে।

দেখা দিল দেহের অতীত কোন্ দেহ এই মোর,
ছিন্ন করি' বস্তুবাঁধন ডোর।
শুধু কেবল বিপুল অনুভূতি,
গভীর হতে বিচ্ছুরিত আনন্দময় দ্যুতি,
শুধু কেবল গানেই ভাষা যার,
পুষ্পিত ফাল্গুনের ছন্দে গন্ধে একাকার ;
নিমেষহারা চেয়ে-থাকার দূর অপারের মাঝে
ইঙ্গিত যার বাজে।
যে-দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো,
নাম-না-জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো,
যে-দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে ॥

শান্তিনিকেতন
১১।৩।৩৭

পলায়নী

যে পলায়নের অসীম তরণী
বাহিছে সূর্যতারা
সেই পলায়নে দিবসরজনী
ছুটেছে গঙ্গাধারা।
চিরধাবমান নিখিল বিশ্ব
এ পলায়নের বিপুল দৃশ্য,
এই পলায়নে ভূত ভবিষ্য
দীক্ষিছে ধরণীরে।
জলের ছায়া সে দ্রুততালে বয়,
কঠিন ছায়া সে ঐ লোকালয়,
একই প্রলয়ের বিভিন্ন লয়
স্থিরে আর অস্থিরে ॥

সৃষ্টি যখন আছিল নবীন
নবীনতা নিয়ে এলে।
ছেলেমানুষির স্রোতে নিশিদিন
চলো অকারণ খেলে।
লীলাছলে তুমি চির পথহারা,
বন্ধনহীন নৃত্যের ধারা,
তোমার কূলেতে সীমা দিয়ে কা'রা
বাঁধন গড়িছে মিছে।
আবাঁধা ছন্দে হেসে যাও সরি'
পাথরের মুঠি শিথিলিত করি',
বাঁধা ছন্দের নগরনগরী
ধুলায় মিলায় পিছে॥

অচঞ্চলের অমৃত বরিষে
চঞ্চলতার নাচে।
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলি সে
নেই নেই ক'রে আছে।
ভিত ফেঁদে যারা তুলিছে দেয়াল
তা'রা বিধাতার মানে না খেয়াল,
তা'রা বুঝিল না,—অনন্তকাল
অচির কালেরই মেলা।

সেঁজুতি

বিজয় তোরণ গাঁথে তা'রা যত
আপনার ভারে ভেঙে পড়ে তত,
খেলা করে কাল বালকের মতো
ল'য়ে তার ভাঙা ঢেলা ॥

ওরে মন, তুই চিন্তার টানে
বাঁধিস নে আপনারে,
এই বিশ্বের সুদূর ভাসানে
অনায়াসে ভেসে যা রে ॥
কী গেছে তোমার কী হয়েছে আর
নাই ঠাঁই তার হিসাব রাখার,
কী ঘটিতে পারে জবাব তাহার
নাইবা মিলিল কোনো।
ফেলিতে ফেলিতে যাহা ঠেকে হাতে,
তাই পরশিয়া চলো দিনে রাতে,
যে সুর বাজিল মিলাতে মিলাতে
তাই কান দিয়ে শোনো ॥

এর বেশি যদি আরো কিছু চাও
দুঃখই তাহে মেলে।
যেটুকু পেয়েছ তাই যদি পাও
তাই নাও, দাও ফেলে।

৭525 এ · ২৫.৫.৬১·

যুগ যুগ ধরি' জেনো মহাকাল
চলার নেশায় হয়েছে মাতাল,
ডুবিছে ভাসিছে আকাশ পাতাল
আলোক আঁধার বহি'।
দাঁড়াবে না কিছু তব আহ্বানে,
ফিরিয়া কিছু না চাবে তোমা পানে,
ভেসে যদি যাও যাবে একখানে
সকলের সাথে রহি'॥

শান্তিনিকেতন
১৯ চৈত্র, ১৩৪৩

স্মরণ

যখন রবো না আমি মর্ত্যকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

হেথায় যে মঞ্জরী দোলে শাখে শাখে
পুচ্ছ নাচায়ে যত পাখি গায়,
ওরা মোর নাম ধ'রে কভু নাহি ডাকে
মনে নাহি করে বসি' নিরালায়।
কত যাওয়া কত আসা এই ছায়াতলে
আনমনে নেয় ওরা সহজেই,
মিলায় নিমেষে কত প্রতি পলে পলে
হিসাব কোথাও তার কিছু নেই।
ওদের এনেছে ডেকে আদি সমীরণে
ইতিহাস-লিপিহারা যেই কাল
আমারে সে ডেকেছিল কভু খনে খনে
রক্তে বাজায়েছিল তারি তাল।

সেদিন ভুলিয়াছিনু কীর্তি ও খ্যাতি
বিনাপথে চলেছিল ভোলা মন,
চারিদিকে নামহারা ক্ষণিকের জ্ঞাতি
আপনারে করেছিল নিবেদন।
সেদিন ভাবনা ছিল মেঘের মতন
কিছু নাহি ছিল ধরে রাখিবার,
সেদিন আকাশে ছিল রূপের স্বপন,
রং ছিল উড়ো ছবি আঁকিবার।
সেদিনের কোনো দানে ছোটো বড়ো কাজে
স্বাক্ষর দিয়ে দাবি করি নাই,
যা লিখেছি যা মুছেছি শূন্যের মাঝে
মিলায়েছে, দাম তার ধরি নাই।

সেদিনের হারা আমি,—চিহ্নবিহীন
পথ বেয়ে কোরো তার সন্ধান,
হারাতে হারাতে যেথা চলে যায় দিন,
ভরিতে ভরিতে ডালি অবসান।
মাঝে মাঝে পেয়েছিল আহ্বান পাঁতি
যেখানে কালের সীমা-রেখা নেই,—
খেলা করে চলে যায় খেলিবার সাথী
গিয়েছিল দায়হীন সেখানেই।

সেঁজুতি

দিই নাই, চাই নাই রাখিনি কিছুই
ভালোমন্দের কোনো জঞ্জাল,
চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভুঁই
আসন পেতেছে মোর ক্ষণকাল।
সেইখানে মাঝে মাঝে এল যারা পাশে
কথা তা'রা ফেলে গেছে কোন্ ঠাঁই ;
সংসার তাহাদের ভোলে অনায়াসে,
সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।
বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে-আমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার
সে-আমারে কে চিনেছ মর্ত্যকায়ায়,
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন॥

সন্ধ্যা

চলেছিল সারা প্রহর
আমায় নিয়ে দূরে
যাত্রী বোঝাই দিনের নৌকো
অনেক ঘাটে ঘুরে।
দূর্ কেবলি বেড়ে ওঠে
সামনে যতই চাই,
অন্ত যে তার নাই।
দূর্ ছড়িয়ে রইল দিকে দিকে,
আকাশ থেকে দূর্ চেয়ে রয় নির্নিমিখে।
দিনের রৌদ্রে বাজতে থাকে
যাত্রাপথের সুর,
অনেক দূর যে অনেক অনেক দূর।

ওগো সন্ধ্যা শেষ প্রহরের নেয়ে,
ভাসাও খেয়া ভাঁটার গঙ্গা বেয়ে।
পৌঁছিয়ে দাও কূলে,
যেথায় আছ অতি-কাছের
দুয়ারখানি খুলে।
ঐ যে তোমার সন্ধ্যাতারা
মনকে ছুঁয়ে আছে,
ছায়ায় ঢাকা আমলকি বন
এগিয়ে এল কাছে।

দিনের আলো সবার আলো
লাগিয়েছিল ধাঁদা,—
অনেক সেথায় নিবিড় হয়ে
দিল অনেক বাধা।
নানান-কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে
হারানো আর পাওয়ায়
নানানদিকে ধাওয়ায়।
সন্ধ্যা ওগো কাছের তুমি,
ঘনিয়ে এসো প্রাণে,—
আমার মধ্যে তারে জাগাও
কেউ যারে না জানে।

সেঁজুতি

ধীরে ধীরে দাও আঙিনায় আনি
একলারি দীপখানি,
মুখোমুখি চাওয়ার সে দীপ,
কাছাকাছি বসার,
অতি-দেখার আবরণটি খসার।
সব-কিছুরে সরিয়ে, করো
একটু-কিছুর ঠাঁই—
যার চেয়ে আর নাই॥

শান্তিনিকেতন
২২।৪।৩৭

ভাগীরথী

পূর্বযুগে, ভাগীরথী, তোমার চরণে দিল আনি
মর্ত্যের ক্রন্দনবাণী ;
সঞ্জীবনী তপস্যায় ভগীরথ
উত্তরিল দুর্গম পর্বত,
নিয়ে গেল তোমা কাছে মৃত্যুবন্দী প্রেতের আহ্বান,—
ডাক দিল, আনো আনো প্রাণ,
নিবেদিল, হে চৈতন্যস্বরূপিণী তুমি,
গৈরিক অঞ্চল তব চুমি'
তৃণে শষ্পে রোমাঞ্চিত হোক মরুতল ;
ফলহীনে দাও ফল,
পুষ্পবন্ধ্যালতিকার ঘুচাও ব্যর্থতা,
নির্বাক ভূমির মুখে দাও কথা।
তুমি যে প্রাণের ছবি,
হে জাহ্নবী,—

সেঁজুতি

ধরণীর আদিসুপ্তি ভেঙে দিয়ে যেথা যাও চলে
জাগ্রত কল্লোলে
গানে মুখরিয়া উঠে মাটির প্রাঙ্গণ,
দুই তীরে জেগে ওঠে বন ;
তট বেয়ে মাথা তোলে নগর নগরী
জীবনের আয়োজনে ভাণ্ডার ঐশ্বর্যে ভরি' ভরি'।

মানুষের মুখ্যভয় মৃত্যুভয়,
কেমনে করিবে তারে জয়,
নাহি জানে ;
তাই সে হেরিছে ধ্যানে
মৃত্যুবিজয়ীর জটা হতে
অক্ষয় অমৃত স্রোতে
প্রতিক্ষণে নামিছ ধরায়।
পুণ্যতীর্থতটে সে যে তোমার প্রসাদ পেতে চায়।

সে ডাকিছে, মিথ্যা শঙ্কা নাগপাশ ঘুচাও ঘুচাও,
মরণেরে যে কালিমা লেপিয়াছি সে তুমি মুছাও ;
গম্ভীর অভয় মূর্তি মরণের
তব কলধ্বনি মাঝে গান ঢেলে দিক্ তরণের
এ জন্মের শেষ ঘাটে ;

সেঁজুতি

নিরুদ্দেশ যাত্রীর ললাটে
স্পর্শ দিক্ আশীর্বাদ তব,
নিক্ সে নূতন পথে যাত্রার পাথেয় অভিনব ;
শেষ দণ্ডে ভরে দিক্ তার কান
অজানা সমুদ্রপথে তব নিত্য অভিসার গান ॥

শান্তিনিকেতন
২৬।৪।৩৭

তীর্থযাত্রিণী

তীর্থের যাত্রিণী ও যে, জীবনের পথে
শেষ আধক্রোশটুকু টেনে টেনে চলে কোনোমতে।
হাতে নাম-জপ ঝুলি,
পাশে তার রয়েছে পুঁটুলি।
ভোর হতে ধৈর্য ধরি' বসি' ইস্টেশনে
অস্পষ্ট ভাবনা আসে মনে,
আর কোনো ইস্টেশনে আছে যেন আর কোনো ঠাঁই,
যেথা সব ব্যর্থতাই
আপনায়
হারানো অর্ঘ্যেরে ফিরে পায়.
যেথা গিয়ে ছায়া
কোনো এক রূপ ধরি' পায় যেন কোনো এক কায়া।
বুকের ভিতরে ওর পিছু হতে দেয় দোল,
আশৈশব-পরিচিত দূর সংসারের কলরোল।
প্রত্যাখ্যাত জীবনের প্রতিহত আশা
অজানার নিরুদ্দেশে প্রদোষে খুঁজিতে চলে বাসা।

সেঁজুতি

যে পথে সে করেছিল যাত্রা একদিন
সেখানে নবীন
আলোকে, আকাশ ওর মুখ চেয়ে উঠেছিল হেসে।
সে পথে পড়েছে আজ এসে
অজানা লোকের দল,
তাদের কণ্ঠের ধ্বনি ওর কাছে ব্যর্থ কোলাহল।
যে যৌবনখানি
একদিন পথে যেতে বল্লভেরে দিয়েছিল আনি
মধুমদিরার রসে বেদনার নেশা
দুঃখে সুখে মেশা,
সে রসের রিক্ত পাত্রে আজ শুষ্ক অবহেলা,
মধুপগুঞ্জনহীন যেন ক্লান্ত হেমন্তের বেলা।

আজিকে চলেছে যারা খেলার সঙ্গীর আশে
ওরে ঠেলে যায় পথপাশে ;
যে খুঁজিছে দুর্গমের সাথী
ও পারে না তার পথে জ্বালাইতে বাতি
জীর্ণ কম্পমান হাতে
দুর্যোগের রাতে।
একদিন যারা সবে এ পথ নির্মাণে
লেগেছিল আপনার জীবনের দানে,

ও ছিল তাদেরি মাঝে
নানা কাজে,
সে পথ উহার আজ নহে।
সেথা আজি কোন্ দূত কী বারতা বহে
কোন্ লক্ষ্য পানে
নাহি জানে।
পরিত্যক্ত একা বসি' ভাবিতেছে পাবে বুঝি দূরে
সংসারের গ্লানি ফেলে স্বর্গ-ঘেঁষা দুর্মূল্য কিছুরে।
হায় সেই কিছু
যাবে ওর আগে আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু
ক্ষীণালোকে, প্রতিদিন ধরি-ধরি করি' তারে
অবশেষে মিলাবে আঁধারে।

আলমোড়া
২২ মে, ১৯৩৭

নতুন কাল

কোন্ সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর—
"এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।"

অনেক বাণীর বদল হোলো, অনেক বাণী চুপ,
নতুন কালের নটরাজা নিল নতুন রূপ।
তখন যে সব ছেলেমেয়ে শুনেছে এই ছড়া,
তা'রা ছিল আরেক ছাঁদে গড়া।
প্রদীপ তা'রা ভাসিয়ে দিত পূজা আনত তীরে,
কী জানি কোন্ চোখে দেখত মকরবাহিনীরে।
তখন ছিল নিত্য অনিশ্চয়,
ইহকালের পরকালের হাজার রকম ভয়।
জাগত রাজার দারুণ খেয়াল, বর্গি নামত দেশে,
ভাগ্যে লাগত ভূমিকম্প হঠাৎ এক নিমেষে।
ঘরের থেকে খিড়কি ঘাটে চলতে হোত ডর,
লুকিয়ে কোথায় রাজদস্যুর চর।
আঙিনাতে শুনত পালাগান,
বিনা দোষে দেবীর কোপে সাধুর অসম্মান।

সামান্য ছুতায়
ঘরের বিবাদ গ্রামের শত্রুতায়
গুপ্ত চালের লড়াই যেত লেগে,
শক্তিমানের উঠত গুমর জেগে।
হার্‌ত যে তার ঘুচত পাড়ায় বাস,
ভিটেয় চলত চাষ।
ধর্মছাড়া কারো নামে পাড়বে যে দোহাই
ছিল না সেই ঠাঁই।
ফিস্‌ফিসিয়ে কথা কওয়া সংকোচে মন ঘেরা,
গৃহস্থবৌ, জিব কেটে তার হঠাৎ পিছন-ফেরা ;
আলতা পায়ে, কাজল চোখে, কপালে তার টিপ,
ঘরের কোণে জ্বালে মাটির দীপ।
মিনতি তার জলেস্থলে, দোহাই-পাড়া মন,
অকল্যাণের শঙ্কা সারাক্ষণ।
আয়ুলাভের তরে
বলির পশুর রক্ত লাগায় শিশুর ললাট 'পরে।
রাত্রিদিবস সাবধানে তার চলা,
অশুচিতার ছোঁয়াচ কোথায় যায় না কিছুই বলা।
ওদিকেতে মাঠে বাটে দস্যুরা দেয় হানা,
এদিকে সংসারের পথে অপদেবতা নানা।
জানা কিংবা না-জানা সব অপরাধের বোঝা,
ভয়ে তারি হয় না মাথা সোজা।

এরি মধ্যে গুন্‌গুনিয়ে উঠল কাহার স্বর—
“এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।”

সেদিনো সেই বইতেছিল উদার নদীর ধারা,
ছায়া-ভাসান দিতেছিল সাঁজ সকালের তারা।
হাটের ঘাটে জমেছিল নৌকো মহাজনী,
রাত না যেতে উঠেছিল দাঁড়-চালানো ধ্বনি।
শান্ত প্রভাত কালে
সোনার রৌদ্র পড়েছিল জেলেডিঙির পালে।
সন্ধ্যেবেলায় বন্ধ আসা-যাওয়া,
হাঁসবলাকার পাখার ঘায়ে চমকেছিল হাওয়া।
ডাঙায় উনুন পেতে
রান্না চড়েছিল মাঝির বনের কিনারেতে।
শেয়াল ক্ষণে ক্ষণে
উঠতেছিল ডেকে ডেকে ঝাউয়ের বনে বনে

কোথায় গেল সেই নবাবের কাল,
কাজির বিচার, শহর কোতোয়াল।
পুরাকালের শিক্ষা এখন চলে উজান-পথে,
ভয়ে-কাঁপা যাত্রা সে নেই বলদটানা রথে।

ইতিহাসের গ্রন্থে আরো খুলবে নতুন পাতা,
নতুন রীতির সূত্রে হবে নতুন জীবন গাঁথা।
যে হোক রাজা যে হোক মন্ত্রী কেউ র'বে না তা'রা,
বইবে নদীর ধারা,
জেলেডিঙি চিরকালের, নৌকো মহাজনী,
উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি।
প্রাচীন অশথ আধা ডাঙায় জলের 'পরে আধা,
সারারাত্রি গুঁড়িতে তার পান্‌সি রইবে বাঁধা।

তখনো সেই বাজবে কানে যখন যুগান্তর
"এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।"

আলমোড়া
২৫ মে, ১৯৩৭

চল্‌তি ছবি

রোদ্দুরেতে ঝাপসা দেখায় ঐ যে দূরের গ্রাম
যেমন ঝাপসা না-জানা ওর নাম।
পাশ দিয়ে যাই উড়িয়ে ধূলি, শুধু নিমেষতরে
চল্‌তি ছবি পড়ে চোখের 'পরে।

দেখে গেলেম, গ্রামের মেয়ে কলসি-মাথায়-ধরা,
রঙিন-শাড়ি-পরা,
দেখে গেলেম, পথের ধারে ব্যবসা চালায় মুদি ;
দেখে গেলেম, নতুন বধূ আধেক দুয়ার রুধি'
ঘোমটা থেকে ফাঁক ক'রে তার কালো চোখের কোণা
দেখছে চেয়ে পথের আনাগোনা।
বাঁধানো বটগাছের তলায় পড়তি রোদের বেলায়
গ্রামের ক'জন মাতব্বরে মগ্ন তাসের খেলায়।

এইটুকুতে চোখ বুলিয়ে আবার চলি ছুটে,
এক মুহূর্তে গ্রামের ছবি ঝাপসা হয়ে উঠে।

ঐ না-জানা গ্রামের প্রান্তে সকাল বেলায় পুবে
সূর্য ওঠে, সন্ধ্যে বেলায় পশ্চিমে যায় ডুবে।
দিনের সকল কাজে,
স্বপ্নদেখা রাতের নিদ্রামাঝে,
ঐ ঘরে, ঐ মাঠে,
ঐখানে জল-আনার পথে ভিজে পায়ের ঘাটে,
পাখিডাকা ঐ গ্রামেরি প্রাতে,
ঐ গ্রামেরি দিনের অন্তে স্তিমিত-দীপ রাতে
তরঙ্গিত দুঃখসুখের নিত্য ওঠা-নাবা,
কোনোটা বা গোপন মনে, বাইরে কোনোটা বা।
তা'রা যদি তুলত ধ্বনি, তাদের দীপ্ত শিখা
ঐ আকাশে লিখত যদি লিখা,
রাত্রিদিনকে কাঁদিয়ে-তোলা ব্যাকুল প্রাণের ব্যথা
পেত যদি ভাষার উদ্বেলতা,
তবে হোথায় দেখা দিত পাথর-ভাঙা স্রোতে
মানব-চিত্ত তুঙ্গ-শিখর হতে
সাগর-খোঁজা নির্ঝর সেই, গর্জিয়া নর্তিয়া
ছুটছে যাহা নিত্যকালের বক্ষে আবর্তিয়া
কান্নাহাসির পাকে,

তাহা হোলে তেমনি করেই দেখে নিতেম তাকে
চমক লেগে হঠাৎ পথিক দেখে যেমন ক'রে
নায়েগারার জলপ্রপাত অবাক্ দৃষ্টি ভ'রে।

যুদ্ধ লাগল স্পেনে ;
চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।
সংবাদ তার মুখর হোলো দেশমহাদেশ জুড়ে,
সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে
দিকে দিকে যন্ত্র-গরুড় রথে
উদয়-রবির পথ পেরিয়ে অস্তরবির পথে।
কিন্তু যাদের নাই কোনো সংবাদ,
কণ্ঠে যাদের নাইকো সিংহনাদ,
সেই যে লক্ষকোটি মানুষ কেউ কালো কেউ ধলো,
তাদের বাণী কে শুনছে আজ বলো।
তাদের চিত্ত-মহাসাগর উদ্দাম উত্তাল
মগ্ন করে অন্তবিহীন কাল ;
ঐ তো তাহা সম্মুখেতেই, চারদিকে বিস্তৃত
পৃথ্বীজোড়া মহাতুফান, তবু দোলায় নি তো
তাহারি মাঝখানে-বসা আমার চিত্তখানি।
এই প্রকাণ্ড জীবননাট্যে কে দিয়েছে টানি'

প্রকাণ্ড এক অটল যবনিকা।
ওদের আপন ক্ষুদ্র প্রাণের শিখা
যে আলো দেয় একা,
পূর্ণ ইতিহাসের মূর্তি যায় না তাহে দেখা।

এই পৃথিবীর প্রান্ত হতে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি
জেনেছে আজ তারার বক্ষে উজ্জ্বালিত সৃষ্টি
উন্মথিত বহ্নি-সিন্ধু-প্লাবন নির্ঝরে
কোটি যোজন দূরত্বেরে নিত্য লেহন করে।
কিন্তু এই যে এই মুহূর্তে বেদন হোমানল
আলোড়িছে বিপুল চিত্ততল
বিশ্বধারায় দেশে দেশান্তরে
লক্ষ লক্ষ ঘরে,
আলোক তাহার দাহন তাহার, তাহার প্রদক্ষিণ
যে অদৃশ্য কেন্দ্র ঘিরে চলছে রাত্রিদিন
তাহা মর্ত্যজনের কাছে
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে।
যেমন শান্ত যেমন স্তব্ধ দেখায় মুগ্ধ চোখে
বিরামহীন জ্যোতির ঝঞ্ঝা নক্ষত্র আলোকে।

আলমোড়া

ঘর ছাড়া

তখন একটা রাত,—উঠেছে সে তড়বড়ি,
কাঁচা ঘুম ভেঙে। শিয়রেতে ঘড়ি
কর্কশ সংকেত দিল নির্মম ধ্বনিতে।
অঘ্রাণের শীতে
এ বাসার মেয়াদের শেষে
যেতে হবে আত্মীয়-পরশহীন দেশে
ক্ষমাহীন কর্তব্যের ডাকে।
পিছে পড়ে থাকে
এবারের মতো
ত্যাগযোগ্য গৃহসজ্জা যত।
জরাগ্রস্ত তক্তপোস কালিমাখা শতরঞ্চ পাতা ;
আরামকেদারা ভাঙা-হাতা ;
পাশের শোবার ঘরে
হেলে-পড়া টিপয়ের 'পরে
পুরোনো আয়না দাগ-ধরা ;
পোকা-কাটা হিসাবের খাতা-ভরা

কাঠের সিন্দুক এক ধারে ;
দেয়ালে ঠেসান-দেওয়া সারে সারে
বহু বৎসরের পাঁজি ;
কুলুঙ্গিতে অনাদৃত পূজার ফুলের জীর্ণ সাজি।
প্রদীপের স্তিমিত শিখায়
দেখা যায়
ছায়াতে জড়িত তা’রা
স্তম্ভিত রয়েছে অর্থহারা।

ট্যাক্সি এল দ্বারে, দিল সাড়া
হুংকার পরুষরবে। নিদ্রায় গম্ভীর পাড়া
রহে উদাসীন।
প্রহরীশালায় দূরে বাজে সাড়ে তিন।

শূন্যপানে চক্ষু মেলি’
দীর্ঘশ্বাস ফেলি’
দূরযাত্রী নাম নিল দেবতার,
তালা দিয়ে রুধিল দুয়ার।
টেনে নিয়ে অনিচ্ছুক দেহটিরে
দাঁড়াল বাহিরে।

ঊর্ধ্বে কালো আকাশের ফাঁকা
ঝাঁট দিয়ে, চলে গেল বাদুড়ের পাখা।
যেন সে, নির্মম
অনিশ্চিত-পানে-ধাওয়া অদৃষ্টের প্রেতচ্ছায়াসম।
বৃদ্ধবট মন্দিরের ধারে,
অজগর অন্ধকার গিলিয়াছে তারে।
সদ্য মাটিকাটা পুকুরের
পাড়ি ধারে বাসা বাঁধা মজুরের
খেজুরের পাতা-ছাওয়া,—ক্ষীণ আলো করে মিট্ মিট্,
পাশে ভেঙে-পড়া পাঁজা। তলায় ছড়ানো তার ইঁট।
রজনীর মসীলিপ্তি মাঝে
লুপ্তরেখা সংসারের ছবি,—ধানকাটা কাজে
সারাবেলা চাষীর ব্যস্ততা ;
গলা-ধরাধরি কথা
মেয়েদের ; ছুটি-পাওয়া
ছেলেদের ধেয়ে-যাওয়া
হৈ হৈ রবে ; হাটবারে ভোরবেলা
বস্তা-বহা গোরুটাকে তাড়া দিয়ে ঠেলা,—
আঁকড়িয়া মহিষের গলা
ওপারে মাঠের পানে রাখাল ছেলের ভেসে-চলা।
নিত্যজানা সংসারের প্রাণলীলা না উঠিতে ফুটে
যাত্রী লয়ে অন্ধকারে গাড়ি যায় ছুটে।

সেঁজুতি

যেতে যেতে পথপাশে
পানা পুকুরের গন্ধ আসে,
সেই গন্ধে পায় মন
বহু দিনরজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।
আঁকাবাঁকা গলি
রেলের স্টেশনপথে গেছে চলি ;
দুই পাশে বাসা সারি সারি ;
নরনারী
যে যাহার ঘরে
রহিল আরাম শয্যা 'পরে।
নিবিড় আঁধার-ঢালা আমবাগানের ফাঁকে
অসীমের টিকা দিয়া বরণ করিয়া স্তব্ধতাকে
শুকতারা দিল দেখা।
পথিক চলিল একা
অচেতন অসংখ্যের মাঝে।
সাথে সাথে জনশূন্য পথ দিয়ে বাজে
রথের চাকার শব্দ হৃদয়বিহীন ব্যস্ত সুরে
দূর হতে দূরে॥

শ্রীনিকেতন
২২ নভেম্বর, ১৯৩৬

জন্মদিন

দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ,
ধ্বনির ঝড়ে বিপন্ন ঐ লোক।
জন্মদিনের মুখর তিথি যারা ভুলেই থাকে,
দোহাই ওগো, তাদের দলে লও এ মানুষটাকে,
সজ্‌নে পাতার মতো যাদের হাল্‌কা পরিচয়,
দুলুক খসুক শব্দ নাহি হয়।

সবার মাঝে পৃথক ও যে ভিড়ের কারাগারে
খ্যাতি-বেড়ির নিরন্ত ঝংকারে।
সবাই মিলে নানা রঙে রঙিন করছে ওরে
নিলাজমঞ্চে রাখছে তুলে ধ'রে,
আঙুল তুলে দেখাচ্ছে দিনরাত ;
লুকোয় কোথা ভেবে না পায়, আড়াল ভূমিসাৎ।

দাও না ছেড়ে ওকে
স্নিগ্ধ আলো শ্যামল ছায়া বিরল কথার লোকে,
বেড়াবিহীন বিরাট ধূলি'পর,
সেই যেখানে মহাশিশুর আদিম খেলাঘর।

ভোরবেলাকার পাখির ডাকে প্রথম খেয়া এসে
ঠেকল যখন সব প্রথমের চেনাশোনার দেশে;
নাম্‌ল ঘাটে যখন তারে সাজ রাখে নি ঢেকে,
ছুটির আলো নগ্ন গায়ে লাগ্‌ল আকাশ থেকে,
যেমন ক'রে লাগে তরীর পালে,
যেমন লাগে অশোক গাছের কচি পাতার ডালে।
নাম-ভোলা ফুল ফুটল ঘাসে ঘাসে
সেই প্রভাতের সহজ অবকাশে।
ছুটির যজ্ঞে পুষ্পহোমে জাগল বকুলশাখা,
ছুটির শূন্যে ফাগুনবেলা মেল্‌ল সোনার পাখা।

ছুটির কোণে গোপনে তার নাম
আচম্‌কা সেই পেয়েছিল মিষ্টি সুরের দাম;
কানে কানে সে নাম-ডাকার ব্যথা উদাস করে
চৈত্রদিনের স্তব্ধ দুই প্রহরে।
আজ সবুজ এই বনের পাতায় আলোর ঝিকিমিকি
সেই নিমেষেব তারিখ দিল লিখি'।

তাহারে ডাক দিয়েছিল পদ্মানদীর ধারা,
কাঁপন-লাগা বেণুর শিরে দেখেছে শুকতারা ;
কাজল-কালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে
নীল ছায়াটি বিছিয়েছিল তটের বনে বনে ;
ও দেখেছে গ্রামের বাঁকা বাটে
কাঁখে কলস মুখর মেয়ে চলে স্নানের ঘাটে ;
সর্ষে-তিসির ক্ষেতে
দুই-রঙা সুর মিলেছিল অবাক আকাশেতে ;
তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অস্তরবির রাগে
বলেছিল, এই তো ভালো লাগে।
সেই যে ভালো-লাগাটি তার যাক সে রেখে পিছে
কীর্তি যা সে গেঁথেছিল, হয় যদি হোক মিছে ;
না যদি রয় নাই রহিল নাম,
এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম ॥

আলমোড়া
২২ বৈশাখ, ১৩৪৪

প্রাণের দান

অব্যক্তের অন্তঃপুরে উঠেছিলে জেগে,
তারপর হতে তরু, কী ছেলেখেলায়
নিজেরে ঝরায়ে চলো চলাহীন বেগে,
পাওয়া দেওয়া দুই তব হেলায় ফেলায়।
প্রাণের উৎসাহ নাহি পায় সীমা খুঁজি'
মর্মরিত মাধুর্যের সৌরভ সম্পদে।
মৃত্যুর উৎসাহ সেও অফুরন্ত বুঝি
জীবনের বিত্ত নাশ করে পদে পদে।
আপনার সার্থকতা আপনার প্রতি
আনন্দিত ঔদাসীন্যে ; পাও কোন্ সুধা
রিক্ততায় ; পরিতাপ-হীন আত্মক্ষতি
মিটায় জীবনযজ্ঞে মরণের ক্ষুধা।
এমনি মৃত্যুর সাথে হোক মোর চেনা,
প্রাণেরে সহজে তার করিব খেলেনা।

শান্তিনিকেতন
১ মার্চ, ১৯৩৮

নিঃশেষ

শরৎ বেলার বিত্তবিহীন মেঘ
হারায়েছে তা'র ধারাবর্ষণ বেগ ;
ক্লান্তি আলসে যাত্রার পথে দিগন্ত আছে চুমি',
অঞ্জলি তব বৃথা তুলিয়াছ হে তরুণী বনভূমি।
শান্ত হয়েছে দিকহারা তার ঝড়ের মত্ত লীলা,
বিদ্যুৎপ্রিয়া স্মৃতির গভীরে হোলো অন্তঃশীলা।
সময় এসেছে, নির্জন গিরিশিরে
কালিমা ঘুচায়ে শুভ্র তুষারে মিশে যাবে ধীরে ধীরে।
অস্ত সাগর পশ্চিমপারে সন্ধ্যা নামিবে যবে
সপ্ত ঋষির নীরব বীণার রাগিণীতে লীন হবে।
তবু যদি চাও শেষ দান তার পেতে,
ঐ দেখো ভরা ক্ষেতে
পাকা ফসলের দোদুল্য অঞ্চলে
নিঃশেষে তার সোনার অর্ঘ্য রেখে গেছে ধরাতলে।
সে কথা স্মরিয়ো, চলে যেতে দিয়ো তারে,
লজ্জা দিয়ো না নিঃস্ব দিনের নিঠুর রিক্ততারে॥

শান্তিনিকেতন
৮।৪।৩৮

প্রতীক্ষা

অসীম আকাশে মহাতপস্বী
মহাকাল আছে জাগি'।
আজিও যাহারে কেহ নাহি জানে,
দেয়নি যে দেখা আজো কোনোখানে,
সেই অভাবিত কল্পনাতীত
আবির্ভাবের লাগি'
মহাকাল আছে জাগি'।

বাতাসে আকাশে যে নব রাগিণী
জগতে কোথাও কখনো জাগে নি
রহস্যলোকে তারি গান সাধা
চলে অনাহত রবে।
ভেঙে যাবে বাঁধ স্বর্গপুরের,
প্লাবন বহিবে নূতন সুরের,
বধির যুগের প্রাচীন প্রাচীর
ভেসে চলে যাবে তবে।

সেঁজুতি

যার পরিচয় কারো মনে নাই,
যার নাম কভু কেহ শোনে নাই,
না জেনে নিখিল পড়ে আছে পথে
যার দরশন মাগি'—
তারি সত্যের অপরূপ রসে
চমকিবে মন অদ্ভুত পরশে,
মৃত পুরাতন জড় আবরণ
মুহূর্তে যাবে ভাগি',
যুগ যুগ ধরি' তাহার আশায়
মহাকাল আছে জাগি' ॥

শান্তিনিকেতন
৪।১০।৩৬

পরিচয়

একদিন তরীখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে,
বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে।
তোমরা শুধায়েছিলে মোরে ডাকি'
পরিচয় কোনো আছে না কি,
যাবে কোন্‌খানে।
আমি শুধু বলেছি, কে জানে।

নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান
একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান।
সেই গান শুনি'
কুসুমিত তরুতলে তরুণ তরুণী
তুলিল অশোক,
মোর হাতে দিয়ে তা'রা কহিল, এ আমাদেরি লোক।

আর কিছু নয়,
সে মোর প্রথম পরিচয়।

তারপরে জোয়ারের বেলা
সাঙ্গ হোলো, সাঙ্গ হোলো তরঙ্গের খেলা,
কোকিলের ক্লান্ত গানে
বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মাৎ যেন মনে আনে ;
কনকচাঁপার দল পড়ে ঝুরে,
ভেসে যায় দূরে,—
ফাল্গুনের উৎসব রাতির
নিমন্ত্রণ লিখন পাঁতির
ছিন্ন অংশ তা'রা
অর্থহারা।
ভাঁটার গভীর টানে
তরীখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে।
নূতন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়ে
সুধাইছে দূর হতে চেয়ে
সন্ধ্যার তারার দিকে
বহিয়া চলেছে তরণী কে।

সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার—

—মোর নাম এই ব'লে খ্যাত হোক,—
আমি তোমাদেরি লোক।—
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়॥

শান্তিনিকেতন
১৩ মাঘ, ১৩৪৩

পালের নৌকা

তীরের পানে চেয়ে থাকি পালের নৌকা ছাড়ি',
গাছের পরে গাছ ছুটে যায়, বাড়ির পরে বাড়ি।
দক্ষিণে ও বামে
গ্রামের পরে গ্রামে
ঘাটের পরে ঘাটগুলো সব পিছিয়ে চলে যায়
ভোজবাজিরি প্রায়।

নাইছে যারা তারা যেন সবাই মরীচিকা
যেমনি চোখে ছবি আঁকে মোছে ছবির লিখা!
আমি যেন চেপে আছি মহাকালের তরী,
দেখছি চেয়ে যে খেলা হয় যুগযুগান্ত ধরি'।
পরিচয়ের যেমন শুরু তেমনি তাহার শেষ,
সামনে দেখা দেয়, পিছনে অমনি নিরুদ্দেশ।
ভেবেছিলুম ভুলব না যা, তাও যাচ্ছি ভুলে,
পিছু-দেখার ঘুচিয়ে বেদন চলছি নতুন কূলে।

পেতে পেতেই ছাড়া
দিনরাত্তির মনটাকে দেয় নাড়া।
এই নাড়াতেই লাগছে খুশি, লাগছে ব্যথা কভু,
বেঁচে-থাকার চলতি খেলা লাগছে ভালোই তবু।
বারেক ফেলা, বারেক তোলা, ফেলতে ফেলতে যাওয়া—
এ'কেই বলে জীবন তরীর চলন্ত দাঁড় বাওয়া।
তাহার পরে রাত্রি আসে, দাঁড়টানা যায় থামি,
কেউ কারেও দেখতে না পায় আঁধার-তীর্থগামী।
ভাঁটার স্রোতে ভাসে তরী, অকূলে হয় হারা
যে সমুদ্রে অস্তে নামে কালপুরুষের তারা॥

চলাচল

ওরা তো সব পথের মানুষ, তুমি পথের ধারের,
ওরা কাজে চলছে ছুটে, তুমি কাজের পারের।
বয়স তোমায় অনেক দিল, অনেক নিল কেড়ে.
রইল যত তাহার চেয়ে অধিক গেল ছেড়ে।
চিহ্ন পড়ে, তারে ঢাকে নতুন চিহ্ন এসে,
কোনো চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রয় না অবশেষে।
যেথায় ছিল চেনা লোকের নীড়
অনায়াসে জমল সেথায় অচেনাদের ভিড়।
তুমি শান্ত হাসি হাসো যখন ওরা ভাবে
ওদের বেলায় অক্ষত দিন এমনি করেই যাবে।

মায়া

১

করেছিনু যত সুরের সাধন
নতুন গানে,
খসে পড়ে তার স্মৃতির বাঁধন
আলগা টানে।
পুরানো অতীতে শেষে মিলে যায়।
বেড়ায় ঘুরে,
প্রেতের মতন জাগায় রাত্রি
মায়ার সুরে।

২

ধরা নাহি দেয় কণ্ঠ এড়ায়
যে সুরখানি
স্বপ্ন গহনে লুকিয়ে বেড়ায়
তাহার বাণী।

বুকের কাঁপনে নীরবে দোলে সে
ভিতর পানে,
মায়ার রাগিণী ধ্বনিয়া তোলে সে
সকল খানে।

৩

দিবস ফুরায় কোথা চলে যায়
মর্ত্য কায়া,
বাঁধা পড়ে থাকে ছবির রেখায়
ছায়ার ছায়া।
নিত্য ভাবিয়া করি যার সেবা
দেখিতে দেখিতে কোথা যায় কেবা,
স্বপ্ন আসিয়া রচি’ দেয় তার
রূপের মায়া॥

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গগনেন্দ্রনাথ,

রেখার রঙের তীর হতে তীরে
ফিরেছিল তব মন,
রূপের গভীরে হয়েছিল নিমগন।
গেল চলি' তব জীবনের তরী
রেখার সীমার পার
অরূপ ছবির রহস্য মাঝে
অমল শুভ্রতার॥

শান্তিনিকেতন
১৯।৮।৩৮

National Library,
Calcutta 27

ছুটি

আমার ছুটি আসছে কাছে সকল ছুটির শেষ,
ছবি একটি জাগছে মনে—ছুটির মহাদেশ।
আকাশ আছে স্তব্ধ সেথায়, একটি সুরের ধারা
অসীম নীরবতার কানে বাজাচ্ছে একতারা॥